ইউনিট ১২

বাংলাদেশের বনজ ও খনিজ সম্পদ

ভূমিকা

বনজ ও খনিজ সম্পদ প্রকৃতির উল্লেখযোগ্য অবদান। এ সম্পদ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জাতীয় জীবনের উপর সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। একটি দেশের মোট আয়তনের ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা একান্ত প্রয়োজন হলেও আমাদের আছে মাত্র ৯৩ ভাগ। অপর দিকে, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, কঠিন শিলা ছাড়া বাংলাদেশে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদ আজও আবিস্কৃত হয়নি। নানা সীমাবদ্ধতার কারনে বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ অনাবিস্কৃত ও অনাহোরিত বয়ে গেছে। দেশের জনগন, সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তর্জাতিক সহায়তা পেলে বাংলাদেশের অনাবিষ্কৃত খনিজ সম্পদ আবিষ্কার ও উত্তোলন করে জাতীয় সমৃদ্ধি আনায়ন সম্ভব হবে।

পাঠ- ১ বাংলাদেশের বনজ সম্পদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে খনিজ সম্পদের গুরুত্ব বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশের বনজ সম্পদের বিবরন দিতে পারবেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বনজ সম্পদের গুরুত্ব

ভূমিকা ঃ বনজ সম্পদ প্রকৃতির একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। যেকোন দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা ও অথ্যনৈতিক উন্নয়নে বনজ সম্পদের অবদান অপরিসীম।

বাংলাদেশের বনজ সম্পদের গুরুত্ব ঃ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের বনভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, কর্মসংস্থান ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই কোন না কোনভাবে বনভূমির গুরুত্ব রয়েছে। নিচে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বনভূমির গুরুত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলঃ

১. **কাঠ সরবরাহ ঃ** বাংলাদেশের বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত কাঠ প্রায় সবটাই বনভূমি হতে সংগৃহীত হয়।

২. **জ্বালানি সরবরাহ ঃ** দেশের জ্বালানি চাহিদার বৃহৎ অংশ পূরণ হয় বন হতে।

৩. **ঘর-বাড়ি ও আসবাবপত্র তৈরি ঃ** ঘর-বাড়ির প্রয়োজনীয় উপকরণ; যেমন: বাঁশ, কাঠ সংগৃহীত হয় বন হতে। আবার কাঠের বা বেতের আসবাবপত্র তৈরির উপযুক্ত কাঠ বা বেত বন হতে সংগ্রহ করা হয়।

৪. **পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঃ** বনভূমির দ্বারা পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়। কেননা, ট্রেনের স্লেপার, লঞ্চ, নৌকা, জাহাজ নির্মাণ ইত্যাদির জন্য বনজ কাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। আবার পুল, বৈদ্যুতিক তার, টেলিফোন তারের খুঁটি নির্মাণ কাজেও কাঠের প্রয়োজন হয় যা বন হতে সংগ্রহ করা হয়।

৫. **কর্মসংস্থান ঃ** কর্মসংস্থানের ক্ষেতেও বন বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, বহুলোক বনে মধু, ওষুধি গাছ, কাঠ, মোম ইত্যাদি সংগ্রহ করে। উপরন্তু বন বিভাগে সরকারিভাবে বেশ কিছু ব্যক্তির কর্মসংস্থান হয়।

৬. **কৃষি উন্নয়ন ঃ** বনাঞ্চলের দ্বারা ভূমিক্ষয় রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু ও আবহাওয়ার ভারসাম্য রক্ষা সম্ভব হয় যা কৃষির উন্নয়নের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

৭. **শিল্পোন্নয়ন ঃ** শিল্পের পর্যাপ্ত কাঁচামাল বন হতে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। বাংলাদেশের দিয়াশলাই, কাগজ, নিউজপ্রিন্ট, প্লাইউড প্রভৃতি শিল্প মূলত: বনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

৮. **ওষুধ শিল্পের উন্নয়ন ঃ** বাংলাদেশের কবিরাজী, হেকিমি এবং অন্যান্য গাছগাছড়া ওষুধ শিল্প বনজ উদ্ভিদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যেমনঃ সাধনা, শক্তি ঔষধালয় প্রভৃতি।

৯. **পশু-পাখি সম্পদ ঃ** বাংলাদেশের বনাঞ্চলের কারণে বিভিন্ন প্রকার পশু-পাখি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাধন সম্ভব হয়। পশু-পাখি দেশের সম্পদ।

১০. **বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ঃ** আমাদের বনাঞ্চলের বেত দ্বারা কুটির শিল্পজাত দ্রব্য ও পশুর শিং, দাঁত, চামড়া দ্বারা তৈরি জিনিস বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।

১১. **সরকারি আয়ের উৎস ঃ** বাংলাদেশের বনজ সম্পদ সরকারি আয়ের একটি উৎস।

১২. **পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ঃ** বনাঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে বনাঞ্চলে পর্যটন শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা আছে।

১৩. **মুক্ত আবহাওয়ার সহায়ক ঃ** বনভূমির বৃক্ষরাজি কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্রহণ ও অক্সিজেন সরবরাহ করে বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্য রক্ষা করে। তাই বনভূমি কলুষমুক্ত আবহাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে।

১৪. **দুর্যোগ প্রতিরোধে ঃ** বনভূমি দুর্যোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। ফলে দুর্যোগজনিত কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে দেশ রক্ষা পায়।

১৫. **আর্দ্র আবহাওয়া ঃ** বনভূমি দেশের আবহাওয়ার আর্দ্রতা রক্ষায় সাহায্য করে। আবহাওয়ার আর্দ্রতা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

১৬. **পশুচারণ ক্ষেত্র ঃ** বনভূমি ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পশুচারণ ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কারণ, বনভূমি অঞ্চলে প্রচুর ঘাস জন্মে।

১৭. **বেকার সমস্যার সমাধান ঃ** বাংলাদেশের বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বনভূমির গুরুত্ব রয়েছে। দেশের বহুলোক বন হতে মোম, মধু, ফলমূল, ওষুধের উপাদান, পশুর শিং, চামড়া প্রভৃতি সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

১৮. **দেশের প্রতিরক্ষা ঃ** দেশের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে বনভূমির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গভীর বনাঞ্চল প্রাকৃতিক বাধা হিসেবে কাজ করে থাকে। বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চলের বনভূমি দেশের প্রতিরক্ষা ব্যূহ হিসেবে কাজ করছে।

১৯. **রাজস্ব আয় ঃ** বনজ সম্পদ দেশের রাজস্ব আয়ের একটি অন্যতম উৎস। কাঠ, মধু, গোলপাতা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার বনজ সম্পদ বিক্রি হতে সরকার প্রচুর রাজস্ব আয় করে থাকে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বনজ সম্পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই আমাদের বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

বাংলাদেশের বনজ সম্পদের বিবরণ

ভূমিকা ঃ বনজ সম্পদ একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। এ সম্পদে বাংলাদেশ উন্নত নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, কোন একটি দেশের মোট ভূমির ২৫% বনাঞ্চল থাকা উচিত। এদিক থেকে বাংলাদেশ বনজ সম্পদে অনুন্নত। বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ১৭% বনাঞ্চল।

বাংলাদেশের বনভূমি ঃ বাংলাদেশের বনভূমিকে প্রকৃতি অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১. সুন্দরবন অঞ্চল।
২. সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বন বা ক্রান্তীয় চিরহরিৎ পাতা ঝরা বৃক্ষের বনভূমি।
৩. ক্রান্তীয় পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি।

১. সুন্দরবন অঞ্চল ঃ সুন্দরবন অঞ্চলের আয়তহন ৬০৬০ বর্গ কি.মি.। খুলনা, পটুয়াখালী ও বরিশাল জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাব্যাপী সুন্দরবন অঞ্চল।

সম্পদ ঃ সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, গড়ান, রাইন, ধুন্দল, আমুর, পাওর ইত্রাদি বৃক্ষ এ বনাঞ্চলের সম্পদ। সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচুর গোলপাতাও জন্মে। সুন্দরী বৃক্ষ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকার কারণে এ বনভূমি সুন্দরবন নামে পরিচিত। এছাড়া এখান হতে মধু, মোম, শন ও ওষুধি গাছ সংগ্রহ করা হয়। বাঘ, বানর, হরিণ, কুমির ও বিভিন্ন প্রকার পাখি ও বনাঞ্চলের অবদান।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব ঃ বাংলাদেশের মোট কাঠের ৬০% সুন্দরবনের গাছ হতে সংগৃহীত হয়। নিচে সুন্দরবনের সম্পদের ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব দেয়া হলঃ

(i) দেশের বেশিরভাগ কাঠ সুন্দরবনের গাছ হতে পাওয়া যায়।

(ii) সুন্দরবনের সুন্দরী বৃক্ষ গৃহ ও নৌকা নির্মাণ এবং বৈদ্যুতিক ও টেলিফোন তারের খুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(iii) এ বনাঞ্চল হতে প্রাপ্ত ধুন্দল বৃক্ষ পেন্সিসল শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(iv) গেওয়া বৃক্ষ নিউজপ্রিন্ট ও দিয়াশলাই শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
(v) এ বনভূমি হতে প্রাপ্ত মধু এবং বিভিন্ন ওষুধি বৃক্ষ ওষুধ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।
(vi) এ বনাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার পশু-পাখি দেশের চিড়িয়াখানায় সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ও বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

সুন্দরবন গড়ে উঠার কারণ ঃ এ বনাঞ্চল গড়ে উঠার কারণসমূহ নিম্নরূপঃ
(i) বিভিন্ন নদীর মোহনায় অবস্থান।
(ii) উর্বর মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত অঞ্চল।
(iii) সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা ও লোনা পানির অঞ্চল।
(iv) স্বল্প মানব বসতি ও
(v) এ অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় এবং প্রচুর উত্তাপ বর্তমান।

২. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি ঃ এ বনাঞ্চলের মূল বৈশিষ্ট্য হল সমস্ত গাছের পাতা এক সাথে ঝরে না। ফলে বন সব সময় সবুজ থাকে। তাই একে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতা ঝরা বৃক্ষের বনভূমি বলে।
অবস্থান ও আয়তন ঃ প্রায় সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের কিয়দংশে এ বনভূমির বিস্তার। এ বনাঞ্চলের পরিমাণ প্রায় ৯৪৭২ বর্গ কি.মি.।
বনজ সম্পদ ঃ সেগুন, গর্জন, চাপলাইশ, জারুল, পাম, চিকরাশি, বৈলাম, ময়না, পিটালী ইত্যঅদি বৃক্ষ এ বনভূমিতে প্রচুর পাওয়া যায়। বাঁশ ও বেত এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এছাড়া বনাঞ্চলে নারকেল, জলপাই, কাঞ্চন, আমলকি ও বিভিন্ন ওষুধি গাছ জন্মে। বিভিন্ন প্রকার পশুর মধ্যে আছে হাতি, হরিণ, চিতা বাঘ ইত্যাদি।

ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব
(i) এ অঞ্চলে প্রাপ্ত বাঁশ ও বেত দ্বারা সিলেট ও চট্টগ্রামে বাঁশ ও বেত শিল্প গড়ে উঠেছে।
(ii) আসবাবপত্র, সেতু, রেলওয়ে পিপার প্রভৃতি নির্মাণের কাজে জারুল, চাপলাইশ প্রভৃতি মূল্যবান কাঠ ব্যবহৃত হয়।
(iii) ময়না, পিটালী প্রভৃতি কাঠ দিয়াশলাই এবং প্লাইউড কাজে ব্যবহৃত হয়।
(iv) এ বনাঞ্চল হতে প্রাপ্ত হরিণ, বাঘ, হাতি ইত্যাদির চামড়া, শিং দাঁত নানা প্রকার কুটির শিল্পের কাজে ব্যবহৃত হয়।

৩. ক্রান্তীয় পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের বনভূমি ঃ এরূপ বনভূমির ব্রক্ষের পাতা প্রয়োজনীয় উত্তাপ ও বৃষ্টির অভাবে ঝরে যায় বলে এরূপ বনভূমিকে পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি বলে। স্থানভিত্তিতে এ বনাঞ্চলকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

(ক) মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি
আয়তন ও অবস্থান ঃ এ বনভূমি ৪৪০ বর্গ কি.মি. আয়তনবিশিষ্ট। ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলায় এ বনভূমি অবস্থিত।
সম্পদ ঃ শাল, গজারি, কড়াই, কাঁঠাল, নিম, ঝিকা, বাজনা, বনজাম ইত্যাদি বৃক্ষ পাওয়া যায়।

(খ) রংপুর ও দিনাজপুর জেলার বনভূমি
আয়তন ও অবস্থান ঃ ৩৯ বর্গ কি. মিটার আয়তনসম্পন্ন ও বনভূমি রংপুর ও দিনাজপুরের কিছু অংশে গড়ে উঠেছে।
সম্পদ ঃ এ বনভূমির প্রধান বৃক্ষ শাল। তবে কিছু গজারী বৃক্ষও জন্মে।
ব্যবহার ও গুরুত্ব ঃ এ বনাঞ্চলের বৃক্ষসমূহ মূলত: ঘর-বাড়ি নির্মাণ ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
উপরোক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের আবহাওয়া ও মৃত্তিকা বনজ সম্পদ বৃদ্ধির অনুকূলে তারপরও আমাদের দেশে যে বনভূমি রয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। তথাপি বনভূমি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ফলে আমাদের বনজ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সরকার ও জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার একান্ত প্রয়োজন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের বনজ সম্পদগুলোর নাম লিখুন।
২. বাংলাদেশের বনজ সম্পদের গুরুত্ব লিখুন।
৩. সুন্দরবনের গুরুত্ব কি?
৪. সুন্দরবনের বর্ণনা দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বনজ সম্পদের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
২. বাংলাদেশের বনজ সম্পদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরন দিন।
৩. বাংলাদেশের বনভূমির বিবরন দিন।
৪. বাংলাদেশের বনভূমিগুলির ভৌগলিক অবস্থান নির্দেশ করুন।
৫. সুন্দর বনের বর্ণনা দিন।

পাঠ- ২ বাংলাদেশের খনিজ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের প্রধান প্রধান খনিজ সম্পদের উৎপাদন ও বন্টনের বিবরন দিতে পারবেন;
- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন, বন্টন ও ব্যবহার সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রাকৃতিক গ্যাসের অর্থনেতিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

খনি হতে প্রাপ্ত সম্পদকে খনিজ সম্পদ বলে। বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। শিল্পোন্নয়ন তথা অর্থনেতিক উন্নয়নে খনিজ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে যেসব খনিজ পদার্থ পাওয়া গেছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ফলে খনিজদ্রব্যের চাহিদা মেটানোর জন্য আমাদেরকে বিদেশের উপর নির্ভর করতে হয়।

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের বিবরণ

খনিজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ ঃ বাংলাদেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। শক্তিসম্পদ
২। ধাতব খনিজ
৩। অধাতব খনিজ।

১। শক্তিসম্পদ ঃ বাংলাদেশের শক্তিসম্পদসমূহ হচ্ছে-

(i) প্রাকৃতিক গ্যাস
(ii) কয়লা
(iii) খনিজ তেল।

উৎপাদন ও বণ্টন ঃ নিচে বাংলাদেশের মক্তি সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টনের বর্ণনা দেওয়া হলো-

(i) প্রাকৃতিক গ্যাস ঃ বাংলাদেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস প্রধান। দেশীয় শক্তি সম্পদের শতকরা ৭০ ভাগ যোগান দেয় প্রাকৃতিক গ্যাস। গ্যাস সম্পদে আমরা সমৃদ্ধ।

মোট গ্যাসক্ষেত্র ঃ ২০০০ সাল পর্যন্ত ২২টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রাপ্তিস্থান ঃ তিতাস, হবিগঞ্জ, সিলেট, ছাতক, কৈলাশটিলা, রশিদপুর, সেমুতাং, কুতুবদিয়া, বাখরাবাদ, ভোলা, বেগমগঞ্জ, ফেনী, কামতা, বিয়ানীবাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ, জালালাবাদ, মেঘনা, বেলাবো, সাংগু কূপ, সালদা নদী, মৌলভীবাজার ও হরিপুর।

মোট সঞ্চিতির পরিমাণ ঃ ২৩.০৯৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য মজুদের পরিমাণ ১৩.৭৯০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্রে সঞ্চিতির পরিমাণ নিচের তালিকায় দেওয়া হলো-

বাংলাদেশে মোট গ্যাস মজুদের পরিমাণ (বিলিয়ন ঘনফুট)

গ্যাসক্ষেত্র	পরিমাণ	গ্যাসক্ষেত্র	পরিমাণ
তিতাস (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)	৪১৩৮	হরিপুর (সিলেট)	৪৪৪
হবিগঞ্জ (হবিগঞ্জ)	৩৬৬৯	কামতা (টঙ্গী)	৩২৫
কৈলাশটিলা (সিলেট)	৩৬৫৭	জালালাবাদ	১৫০০
বাখরাবাদ (কুমিল্লা)	১৪৩২	সেমুতাং (পার্বত্য চট্টগ্রাম)	১৬৪
রশিদপুর (মৌলভীবাজার)	২২৪২	মেঘনা (মরিচাকান্দি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া)	১৫৯
সাংগু (চট্টগ্রাম)	১০৩১	বেলাবো (নরসিংদী)	১৯৪
ছাতক (সুনামগঞ্জ)	১৯০০	সালদা নদী (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)	২০০
কুতুবদিয়া (কক্সবাজার)	৭৮০	ফেনী (ফেনী)	১৩২
শাহাবাজপুর (ভোলা)	৫১৪	বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী)	২৫
ফেঞ্চুগঞ্জ (সিলেট)	৩৫০	নিয়ানীবাজার (সিলেট)	২৪৩

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০০০

প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার ঃ বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস শিল্পের কাঁচামাল, জ্বালানি হিসেবে, তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে এবং সার ও কীটনাশক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(ii) কয়লা ঃ বাংলাদেশে কোনো উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা নেই, যা আছে তাও অধিকাংশ নিকৃষ্ট শ্রেণীর। বর্তমানে অনুসন্ধান চালিয়ে কয়েকটি স্থানে লিগনাইট ও বিটুমিনাস শ্রেণীর কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে এগুলো থেকে এখনও উত্তোলন শুরু হয়নি।

প্রাপ্তিস্থান ঃ রংপুরের খালাসপীর, দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া, দীঘিপাড়া, জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ, নবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ, নওগাঁ জেলার পত্নীতলা, সিলেটের লালঘাট, টাকেরহাট, ভাঙ্গারঘাট প্রভৃতি। ফরিদপুরের বাগিয়া ও চান্দাবিল, খুলনার কোলাবিল ও সিলেটে কিছু পীট কয়লা পাওয়া গিয়েছে।

বাংলাদেশে আবিষ্কৃত কয়লার ক্ষেত্রসমূহ ও সঞ্চিতির পরিমাণ ঃ কয়লার উৎপাদন ও বণ্টন নিচের সারণিতে দেওয়া হলো-

কয়লার ক্ষেত্র	**সঞ্চিতির পরিমাণ**
রংপুরের খালাসপীর	৮টি স্তরে ৬৮৫মি. মে.টন
দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া	৬টি স্তরে ৩৮৯ মি. মে.টন
জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ	৭টি স্তরে ১০৫৩মি. মে.টন
দিনাজপুরের দীঘিপাড়া	৭টি স্তর নিরপিত হয়নি
ফরিদপুরের বাগিয়া	১২.৫ কোটি টন
সিলেট	৯১ লক্ষ টন
খুলনা	৮০ লক্ষ টন

(iii) খনিজ তেল ঃ বাংলাদেশে দুইটি খনিজ তেলক্ষেত্র রয়েছে রয়েছে। যথা- (ক) হরিপুর তেলক্ষেত্র (খ) বরমচাল তেলক্ষেত্র।

হরিপুর তেলক্ষেত্র ঃ ১৯৮৬ সালের ২২ ডিসেম্বর এ তেলক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়্ তেলক্ষেত্রে ৪ কোটি ব্যারেল তেল মজুদ আছে। বর্তমানে দৈনিক ৬০০ ব্যারেল তেল উত্তোলিত হয়।

বরমচাল তেলক্ষেত্র ঃ মৌলভীবাজার জেলার বরমচালে দ্বিতীয় তেলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ক্ষেত্র হতে দৈনিক ১২০০ ব্যারেল তৈল উত্তোলন করা হচ্ছে।

অন্যান্য তেলক্ষেত্র ঃ উপরিউক্ত দুইটি তেলক্ষেত্র ছাড়াও চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে, নাটোরের নিমগাঁ, নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ, বরিশালের হিজলা, মুলাদি ও বগুড়ায় তেলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

চিত্র ১ ঃ বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

২। ধাতব খনিজ ঃ ধাতব খনিজগুলো হলো-
(i) তামা (ii) আকরিক লৌহ।

(i) তামা

প্রাপ্তিস্থান ঃ রংপুর জেলার রাণীপুকুর, পীরগঞ্জ ও দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় তামার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

ব্যবহার ঃ ১। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
২। মুদ্রা ও বাসনপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(ii) আকরিক লৌহ

প্রাপ্তিস্থান ঃ চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া অঞ্চলে ভূমিস্থ প্রাচীন শিলার সাথে উন্নতমানের আকরিক লৌহ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ব্যবহার ঃ বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

৩। অধাতব খনিজ ঃ অধাতব খনিজসমুহ নিম্নরূপ-

(i) চুনাপাথর

প্রাপ্তিস্থান ঃ বৃহত্তর সিলেটের টাকেরহাট, ভাঙ্গারহাট, বাগালি বাজার, লালঘাট ও জাফলং-এ চুনাপাথর পাওয়া যায়। ১৯৯৭-৯৮ সালে চুনাপাথর উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩২,৩২৪ মে.টন।

ব্যবহার ঃ (i) গৃহনির্মাণে চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়।
(ii) সিমেন্ট, গ্লাস ও কাগজ শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
(iii) সাবান ও ব্লিচিং পাউডার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(ii) চীনামাটি

প্রাপ্তিস্থান ঃ নেত্রকোনার বিজয়পুর ও রাজশাহীর পীরুলায় চীনামাটি পাওয়া যায়। ১৯৭-৯৮ সালে চীনামাটি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭,৭৩১ হাজার মে.টন।

ব্যবহার ঃ (i) বাসনপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
(ii) বৈদ্যুতিক ইনসুলেটর ও সেনিটারি সরঞ্জাম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
(iii) কাগজ, কৃত্রিমবস্ত্র ও বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক শিল্পে চীনামাটি ব্যবহৃত হয়।

(iii) সিলিকা বালি

প্রাপ্তিস্থান ঃ কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম, চট্টগ্রামের দোহাজারী, সিলেটের নয়াপাড়া, ছাতিয়ানি, শাহজিবাজার, কুলাউড়া ও জামালপুরের বালিঝুরিতে সিলিকা বালি পাওয়া যায়। ১৯৯৪-৯৫ সালে সিলিকা বালি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৯৩ হাজার বর্গফুট।

ব্যবহার ঃ (i) কাঁচ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।
(ii) রাসায়নিক দ্রব্য, রং ও অগ্নিরোধক ইট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(iv) গন্ধক

প্রাপ্তি স্থান ঃ কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়ায় গন্ধক পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে গন্ধকের উৎপাদন নেই বললেই চলে।

ব্যবহার ঃ (i) পেট্রোলিয়াম পরিশোধন কাজে ব্যবহৃত হয়।
(ii) কীটনাশক ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
(iii) বারুদ, দিয়াশলাই ও আতশবাজি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
(iv) বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক শিল্পে গন্ধক ব্যবহৃত হয়।

(v) খনিজ বালি

প্রাপ্তিস্থান ঃ কুতুবদিয়া হতে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খনিজ বালি পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ এটা প্রধানত: ভারি ধাতবশিল্পে ব্যবহৃত হয়।

(vi) কঠিন শিলা

প্রাপ্তিস্থান ঃ রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় কঠিন শিলা পাওয়া যায়। রংপুরের রাণীপুকুর ও দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় শিলাস্তর থেকে বার্ষিক প্রায় ১৭ লক্ষ মে. টন কঠিন শিলা উত্তোলন করা যাবে।

ব্যবহার ঃ রেলপথ নির্মাণ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, বাঁধ ও সেতু নির্মাণে কঠিন শিলা ব্যবহৃত হয়।

(vi) নুড়িপাথর

প্রাপ্তিস্থান ঃ সুনামগঞ্জ জেলার ভোলাগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জ, পঞ্চগড় জেলার সদর থানা, লালমনিরহাট ও সিলেট জেলার তামাবিলে নুড়িপাথর পাওয়া যায়। এর সঞ্চিতির পরিমাণ ৯.৭৫ কোটি মে. টন।

ব্যবহার ঃ (i) গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

(ii) পুল, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করা হয়।
(iii) রেললাইন নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

(vii) লবণ

প্রাপ্তিস্থান ঃ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা ও খুলনা জেলার সমুদ্রের পানি হতে লবণ তৈরি হয়।

উৎপাদনের পরিমাণ ঃ বার্ষিক ৫.৯৫ কোটি মে. টন।

ব্যবহার ঃ (i) খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
(ii) ওষুধ, সার ও রাসায়নিক দ্রব্যে ব্যবহৃত হয়।
(iii) চামড়াশিল্পে পচন নিরোধের জন্য ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ না হলেও প্রাপ্ত খনিজ সম্পদগুলো যথাযথভাবে উত্তোলনের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নসাধন সম্ভব। তাই দেশের খনিজ সম্পদ উত্তোলন এবং এগুলোর যথোপযুক্ত ব্যবহারের জন্য সরকারকে অতিসত্ত্বর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের বণ্টন ও ব্যবহার

ভূমিকা ঃ বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধিশালী না হলে প্রাকৃতিক গ্যাসে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ গ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফেব্রুয়ারি ২০০০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে ২২টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তন্মধ্যে ১২টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে এখন গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে তিতাস গ্যাসক্ষেত্র থেকে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের বিবরণ

নিচে গ্যাসক্ষেত্রগুলো বর্ণনা করা হলো-

১। **হরিপুর গ্যাসক্ষেত্র ঃ** সিলেট জেলার হরিপুরে ১৯৫৫ সালে বাংলাদেশের প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কৃত হয়। ১৯৫৬ সালে এ খনি মহতে গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়। এ খনিতে ৪৪৪ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সঞ্চিত আছে। এ গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ ৯৬.৬৩%।

২। **ছাতক গ্যাসক্ষেত্র ঃ** ১৯৫৯ সালে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতকে এ গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়্ে গ্যাস খুবই উন্নতমানের। বর্তমানে উৎপাদন স্থগিত। এ গ্যাসক্ষেত্রে গ্যাস সঞ্চিতির পরিমাণ ১৯০০ বিলিয়ন ঘনফুট। এতে মিথেনের পরিমাণ ৯৯.০৫%।

৩। **রশিদপুর গ্যাসক্ষেত্র ঃ** ১৯৬০ সালে মৌলভীবাজারের রশিদপুরে এ গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়। এ গ্যাসক্ষেত্র হতে পরীক্ষকভাবে গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়েছে। এ গ্যাসক্ষেত্রে গ্যাস সঞ্চিতির পরিমান ২২৪২ বিলিয়ন ঘনফুট। এটি বাংলাদেশের মোট সঞ্চিত গ্যাসের ১০.৫০%। এ গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ ৯৮.২%।

৪। **তিতাস গ্যাসক্ষেত্র ঃ** ১৯৬২ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তিতাস নামক স্থানে এ গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়। এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গ্যাসক্ষেত্র। এ গ্যাসক্ষেত্রটিতে গ্যাস সঞ্চিতির পরিমাণ ৪১৩৮ বিলিয়ন ঘনফুট। এর পরিমাণ বাংলাদেশে মোট আবিষ্কৃত গ্যাসের ১৯.৩৮%। এ গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ ৯৮.৮০%।

৫। **কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্র ঃ** ১৯৬২ সালে সিলেট জেলার কৈলাশটিলায় এ গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। এখান থেকে সিলেট জেলায় গ্যাস সরবরাহ করা হয়। এ গ্রাসক্ষেত্রে সঞ্চিতির পরিমাণ ৩৬৫৭ বিলিয়ন ঘনফুট। এটি বাংলাদেশে মোট সঞ্চিত গ্যাসের ১৭.১২%। এ গ্যাস ক্ষেত্রে মিথেনের পরিমাণ ৯৫.৭০%।

৬। **হবিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র ঃ** ১৯৬..... সালে হবিগঞ্জ জেলার হবিগঞ্জে এ গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে গ্যাস সঞ্চিতির পরিমাণ ৩৬৬৯ বিলিয়ন ঘনফুট। এটি বাংলাদেশের মোট সঞ্চিত গ্যাসের ১৭.১৮%। এ গ্যাসক্ষেত্রে মিথেনের পরিমাণ ৯৭.৮০%।

৭। **বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্র ঃ** ১৯৬৮ সালে কুমিল্লা জেলার বাখরাবাদে এ খনি আবিষ্কৃত হয়। এ ক্ষেত্রে প্রায় ১৪৩২ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সঞ্চিত আছে। এটি বাংলাদেশের মোট সঞ্চিত গ্যাসের ৬.৭১%। এতে মিথেনের পরিমাণ ৯৪.২০%।

চিত্র ২ ঃ বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্র

৮। **সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র ঃ** ১৯৬৯ সালে বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলার সেমুতাং-এ এ গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ গ্যাস খুবই উন্নতমানের। এ খনি হতে এখনও গ্যাস উত্তোলন আরম্ভ হয়নি। এ গ্যাসক্ষেত্রে গ্যাস সঞ্চিতির পরিমাণ ১৬৪ বিলিয়ন ঘনফুট। এ ক্ষেত্রে মিথেনের পরিমাণ ৯৫.৭২%।

৯। **কুতবদিয়া গ্যাসক্ষেত্র ঃ** ১৯৭৭ সালে কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়ায় এ গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়। এ গ্যাসও উন্নতমানের। এ ক্ষেত্র হতে এখনও গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়নি। এ ক্ষেত্রে গ্যাস সঞ্চিতির পরিমাণ ৭৮০ বিলিয়ন ঘনফুট। এতে মিথেনের পরিমাণ ৯৫.৭২%।

১০। **বেগমগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র ঃ** ১৯৮০ সালে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জে এ খনি আবিষ্কৃত হয়। এ গ্যাস খুবই উন্নতমানের। এ ক্ষেত্র হতে এখনও গ্যাস উত্তোলনের ব্যবস্থা হয়নি। এ খনিতে সঞ্চিত গ্যাসের পরিমাণ ২৫ বিলিয়ন ঘনফুট।

১১। **ফেনী গ্যাসক্ষেত্র ঃ** ১৯৮১ সালে ফেনী জেলায় এ গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। এটিও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গ্যাস। এ খনিতে গ্যাস সঞ্চিতির পরিমাণ ১৩২ বিলিয়ন ঘনফুট। এটি মোট সঞ্চিত গ্যাসের ০.৬২%।

১২। **বিয়ানীবাজার গ্যাসক্ষেত্র ঃ** ১৯৮২ সালে সিলেট জেলার বিয়ানীবাজারে এ গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ গ্যাসক্ষেত্রে গ্যাস সঞ্চিতির পরিমাণ ২৪৩ বিলিয়ন ঘনফুট। এটি মোট সঞ্চিত গ্যাসের ১.১৪%।

১৩। **নরসিংদী গ্যাসক্ষেত্র ঃ** ১৯৯০ সালে নরসিংদী জেলার বেলাবোতে এই গ্যাস ক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৯৪ সাল থেকে এ গ্যাসক্ষেত্র হতে গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়। এ খনিতে গ্যাস সঞ্চিতির পরিমাণ ১৯৪ বিলিয়ন ঘনফুট। এটা দেশের মোট সঞ্চিতির .৯১%।

১৪। **ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র ঃ** ১৯৮৮ সালে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে এ গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। এখানকার গ্যাস উত্তোলন এখনও শুরু হয়নি। এ খনিতে গ্যাস সঞ্চিতির পরিমাণ ৩৫০ বিলিয়ন ঘনফুট। এটা দেশের মোট সঞ্চিতির ১.৬৪%।

১৫। **জালালাবাদ গ্যাসক্ষেত্র ঃ** ১৯৮৯ সালে সিলেট অঞ্চলে এ গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ খনিতে গ্যাস সঞ্চিতির পরিমাণ ১৫০০ বিলিয়ন ঘনফুট। দেশের মোট সঞ্চিতির ৭.০২%।

১৬। **মেঘনা গ্যাসক্ষেত্র ঃ** ১৯৯০ সালে এ গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৯৮ সালে থেকে এ গ্যাসক্ষেত্র হতে গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়। এ খনিতে মোট সঞ্চিতির পরিমাণ ১৫৯ বিলিয়ন ঘনফুট। এটি দেশের মোট সঞ্চিতির ০.৭০% ভাগ।

১৭। **শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র ঃ** ১৯৯৫ সালে এ গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। এখনও এ ক্ষেত্র হতে উত্তোলন শুরু হয়নি। মোট সঞ্চিতির পরিমণ ৫১৪ বিলিয়ন ঘনফুট।

১৮। **সাঙ্গু গ্যাসক্ষেত্র ঃ** ১৯৯৫ সালে এ গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। বর্তমানে এ ক্ষেত্র হতে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে গ্যাস সঞ্চিতির পরিমাণ ২০০ বিলিয়ন ঘনফুট।

১৯। **সালদা গ্যাসক্ষেত্র ঃ** ১৯৯৭ সালে এ গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়। বর্তমানে এখান থেকে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে। এ গ্যাসক্ষেত্রে গ্যাস সঞ্চিতির পরিমাণ ২০০ বিলিয়ন ঘণফুট।

২০। **বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র ঃ** ১৯৯৮ সালে সিলেটের বিবিয়ানাতে এ গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে ৪ ট্রিলিয়ন গ্যাস সঞ্চিত আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

২১। **মৌলভীবাজার গ্যাসক্ষেত্র ঃ** ১৯৯৬ সালে মৌলভীবাজার জেলায় এ গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৯৭ সালে কূপ খননের সময় এখানে দুর্ঘটনা ঘটে। সঞ্চিতির পরিমাণ জানা যায়নি।

২২। **কামতা গ্যাসক্ষেত্র ঃ** ১৯৮২ সালে গাজীপুর জেলার কামতায় এ গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ক্ষেত্র হতে গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়েছে। এ ক্ষেত্রে গ্যাস সঞ্চিতির পরিমাণ ৩২৫ বিলিয়ন ঘনফুট, যা দেশের মোট সঞ্চিতির ১.৫২%।

প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের তালিকা (বিলিয়ন ঘনফুট)

সাল	উৎপাদন
১৯৯৮-৯৯	৩০৭.৪৭৬
১৯৯৯-২০০০	১৫৫.৮৬০

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০০০

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক। নিচে তা তুলে ধরা হলো-

১। **জ্বালানি ঃ** বিভিন্ন চা বাগান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া গৃহের রান্নার কাজেও ব্যবহৃত হয়।

২। **শিল্পের কাঁচামাল ঃ** শিল্পকারখানার কাঁচামাল হিসেবে গ্যাস ব্যবহৃত হয়।

৩। **তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ঃ** তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়।

৪। **কৃষি উন্নয়ন ঃ** সার ও কীটনাশক উৎপাদনে গ্যাস ব্যবহৃত হয়। কৃষিজ যন্ত্রপাতি নির্মাণেও প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। ফলে কৃষি উন্নয়নে প্রাকৃতিক গ্যাস সহায়তা করে।

৫। **বৈদেশিক অর্থ ব্যয় হ্রাস ঃ** আমাদেরকে আগে খনিজ তেল, কয়লা, কেরোসিন ইত্যাদি জ্বালানি হিসেবে আমদানি করতে হত। কিন্তু বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাসের কারণে আমদানি করতে হয় না। ফলে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হ্রাস হচ্ছে।

৬। **কর্মসংস্থান ঃ** গ্যাসের বহুমুখী ব্যবহারের ফলে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

৭। **সরকারি আয়ের উৎস ঃ** এ গ্যাস সরকারি আয়ের একটি অন্যতম উৎস।

৮। **গবেষণার উপকরণ ঃ** গবেষণার কাজে এর ব্যবহার সহজ ও সুলভ।

প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহারের তালিকা (বিলিয়ন ঘনফুট)

সাল	বিদ্যুৎ	সার	শিল্প	বাণিজ্যিক	গৃহস্থালি	অন্যান্য	মোট
১৯৯৮-৯৯	১৪০.৮২	৮২.৭১	৩৫.৭৯	৩.৬৫	২৭.০২	১.০৬	২৯১.০৪
১৯৯৯-২০০০	৭১	৩৭	২০	২	১৫		১৪৫

উৎস ঃ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০০০

উপসংহার ঃ বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাসে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাংলাদেশে যে পরিমাণে গ্যাস সঞ্চিত রয়েছে তা সঠিকভাবে উত্তোলন করে যথাযথ কাজে ব্যবহার করতে পারলে এর অর্থনৈতিক মূল্য আরও বেড়ে যাবে এবং রপ্তানিও করা যাবে। এ জন্য দেশের সরকারকে শীঘ্রই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

বাংলাদেশের অর্থনেতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক গ্যাসের গুরুত্ব বা ভূমিকাঃ

ভূমিকা ঃ বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ না হলেও প্রাকৃতিক গ্যাস পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। ২০০০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে প্রায় ২২টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এ পর্যন্ত যে গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে তা আগামী এক শতাব্দী পর্যন্ত মজুদ থাকবে বলে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে খনিজ সম্পদের অবদান ৫%। তাই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক গ্যাসের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক গ্যাসের ভূমিকা

নিচে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক গ্যাসের ভূমিকা আলোচনা করা হলো-

১। **শিল্পের কাঁচামাল ঃ** প্রাকৃতিক গ্যাস বিভিন্ন শিল্পকারখানা; যেমন- সার কারখানা, সিমেন্ট কারখানা, বস্ত্র, প্লাস্টিক, রবার, রং ও কীটনাশক ওষুধ প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

২। **শিল্পের জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ঃ** দেশে কয়লা ও খনিজ তেলের একান্ত অভাব রয়েছে। ফলে বিভিন্ন শিল্পকারখানায় জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে বাংলাদেশে অনেক গ্যাসভিত্তিক শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে।

৩। **গৃহস্থালির জ্বালানি ঃ** প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় গ্রহস্থালির জ্বালানি কাজে ব্যবহৃত হয়। ফলে বনজ সম্পদের এক অংশ জ্বালানির হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে। অন্যদিকে এটা কালো ধোঁয়ামুক্ত। ফলে একদিকে বনজ সম্পদ রক্ষা পাচ্ছে অন্যদিকে মানুষ পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাচ্ছে।

৪। **বিদ্যুৎ উৎপাদন ঃ** বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য অপরিসীম। ঘোড়াশাল, আশুগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ, শাহজিবাজার প্রভৃতিতে প্রাকৃতিক গ্যাস প্রধানত: জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর ফলে একদিকে যেমন দেশের শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে আমদানিকৃত জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমে যাচ্ছে।

৫। **সিমেন্ট শিল্পে ব্যবহার ঃ** বাংলাদেশের সিমেন্ট কারখানায় প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৬। **কৃষি উন্নয়নে ঃ** কৃষি উন্নয়নে প্রাকৃতিক গ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কীটনাশক ওষুধ ও সার তৈরিতে এবং বিভিন্ন ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরিতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। ফলে কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

৭। **বেকারসমস্যা সমাধান ঃ** প্রাকৃতিক গ্যাস বেকারসমস্যা সমাধান করে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন, বণ্টন, উত্তোলন ও সংরক্ষণ প্রভৃতি কাজে বহু লোক নিয়োগ করা হয়। ফলে বেকারসমস্যা দূরীভূত হয়।

৮। **বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হ্রাস ঃ** আমাদের দেশে জ্বালানি হিসেবে খনিজ তেল আমদানি করে বৈদেশিক মুদ্রার অধিকাংশ এ আমদানি খাতে ব্যয় করা হয়। কিন্তু বর্তমানে খনিজ তেল ও কয়লার পরিবর্তে প্রাকৃতিক গ্যাসকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় বলে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

৯। **রাজস্ব বৃদ্ধি ঃ** সরকারের রাজস্ব আয়ের একটি অন্যতম উৎস এ প্রাকৃতিক গ্যাস। বিভিন্ন শিল্পকারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রহস্থালিতে গ্যাস সরবরাহ করে সরকার প্রতিবছর প্রায় ৬৫ কোটি টাকা আয় করে।

১০।**গ্যাসবাতির ব্যবহার ঃ** রান্নার কাজ ছাড়াও গ্যাসের মাধ্যমে আলো জ্বালানো যায়। বিদ্যুৎ ঘন ঘন চলে যায় বলে বর্তমানে এ বাতির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১১। **গবেষণার উপকরণ ঃ** প্রাকৃতিক গ্যাস গবেষণার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বিভিন্ন প্রযুক্তি উন্নয়নে এবং নতুন নতুন পণ্য উৎপাদনে বিজ্ঞানীদের গবেষণার অন্যতম উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এ প্রাকৃতিক গ্যাস।

বিভিন্ন খাতে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার

সাল	বিদ্যুৎ	সার	শিল্প	বাণিজ্য	গৃহস্থালি	অন্যান্য	মোট
১৯৯৮-'৯৯	১৪০.৮২	৮২.৭১	৩৫.৭৯	৩.৬৫	২৭.০২	১.০৬	২৯১.০৪
১৯৯৯-২০০০	৭১	৩৭	২০	২	১৫		১৪৫

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০০০।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক গ্যাস সংযোগের একটি তালিকা দেয়া হলো-

বাংলাদেশের গ্যাস সংযোগ জুন ১৯৯৭-'৯৮

ব্যবহার	সংযোগ সংখ্যা
আবাসিক	৮১৯৪৮৩টি
বাণিজ্যিক	৮৯১২টি
শিল্পকারখানা	২৮৫১টি
চা বাগান	৬১টি
পাওয়ার প্ল্যান্ট	১৫টি
সার কারখানা	২টি
কাগজ ও মন্ড কারখানা	২টি
সিমেন্ট কারখানা	২টি
মোট	**৮,৩১,৩৩৩টি**

উৎস ঃ বাংলাদেশের পরিসংখ্যান, পকেট বই- ১৯৯৮

উপসংহার ঃ প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের অন্যতম খনিজ সম্পদ। প্রাকৃতিক গ্যাস শিল্পকারখানার কাঁচামাল, জ্বালানি, গৃহস্থালির জ্বালানি, বিদ্যুৎ উৎপাদন, কৃষি উন্নয়ন এবং সরকারের রাজস্ব আয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাই দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য সরকারকে এ প্রাকৃতিক গ্যাসের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা একান্ত কর্তব্য।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার লিখুন।
২। তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রের বর্ণনা দিন।
৩। বাংলাদেশের গ্যাস ক্ষেত্রগুলোর নাম লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
২। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক গ্যাসের ভূমিকা আলোচনা করুন।
৩। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও বন্টন আলোচনা করুন।